PG- 4th Sem.
405, Unit-IV

প্রবন্ধ

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শ

রীনা পাল

রবীন্দ্রনাথ মূলত কবি। কিন্তু মানব জীবনের এমন কোন অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র নেই, যেখানে রবীন্দ্র প্রতিভার ছোঁয়া লাগেনি। শিক্ষাও তার থেকে বাদ পড়েনি। বাল্য ও কৈশোরে দেশের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা খুব মধুর ছিল না। ওরিয়েন্টাল সেমিনারী, নর্মাল স্কুল, বেঙ্গল একাডেমী, ইত্যাদির মত যে সব বিদ্যালয়ে তিনি শৈশবে পড়াশুনা করেছিলেন, তা তাঁর কাছে মোটেই মধুর ছিল না। তাই তিনি লিখেছেন – "আমি বাল্যকালে শিক্ষা ব্যবস্থায় মনে বড়ো পীড়া অনুভব করছি। সেই ব্যবস্থায় আমাকে এত ক্লেশ দিত, আঘাত করত যে বড়ো হয়েও সে অন্যায় ভুলতে পারি নি। কারণ প্রকৃতির বক্ষ থেকে, মানব জীবনের সংস্পর্শ থেকে স্বতন্ত্র করে নিয়ে শিশুকে বিদ্যালয়ের কলের মধ্যে ফেলা হয়। তার অস্বাভাবিক পরিবেষ্টনের নিষ্পেষণে শিশুটিও প্রতিদিন পীড়িত হতে থাকে।"[১] তিনি আরো লিখেছেন – "ইস্কুল বলিতে আমরা যাহা বুঝি সে একটা শিক্ষা দিবার কল। ... মানুষের কাছ হইতে মানুষ যাহা পায় কলের কাছ হইতে তাহা পাইতে পারে না। কল তেল দিতে পারে কিন্তু আলো জ্বালাইবার সাধ্য তাহার নাই।"[২] প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় শিশুকে চার দেওয়ালের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করে তার ভাল লাগা, মন্দ লাগার কোন খবর না নিয়েই তাকে শিক্ষাদানের যে ব্যবস্থা বর্তমান ছিল তার বর্ণনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন – "শিক্ষাকে দেওয়াল দিয়া ঘিরিয়া, গেট দিয়া রুদ্ধ করিয়া, দারোয়ান দিয়া পাহারা বসাইয়া, শাস্তি দ্বারা কণ্টকিত করিয়া, ঘন্টা দ্বারা তাড়া দিয়া মানব জীবনের আরম্ভে এ কী নিরানন্দের সৃষ্টি করা হইয়াছে।"[৩]

শিক্ষার লক্ষ্য যদি হয় চিত্তের জঙ্গমতা সৃষ্টি, দেহ মনের চলতা বিধান, মানুষে মানুষে আত্মীয়তার বন্ধন গড়ে তোলা, তাহলে তার উপযুক্ত পরিবেশ যে আমাদের ইঁট কাঠের আড়ম্বরপূর্ণ অট্টালিকার মধ্যে গড়ে উঠবে না, এ বিষয়ে সংশয় নেই। রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন, অচলায়তনের সব কটি দরজা জানলা খুলে দিয়ে স্বাস্থ্যপ্রদ পরিবেশ গড়ে তুলতে।[৪]

তাই যান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থা থেকে কি করে শিশুদের মুক্তি দেওয়া যায় এ নিয়ে তিনি প্রথম পরীক্ষা শুরু করেন শিলাইদহে থাকতে। পুত্র রথীন্দ্রনাথও গ্রামের কয়েকটি ছেলেকে নিয়ে প্রথম শিক্ষকতা শুরু করেন। পল্লী প্রকৃতির উদার প্রাঙ্গণে এই যে শিক্ষার আয়োজন করেছিলেন, তাই পরিণত রূপ নেয় তাঁর সমগ্র শিক্ষাচিন্তার মধ্যে এবং শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্য আশ্রম স্থাপনের মধ্যে।

Scanned with CamScanner

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাভাবনা শুধুমাত্র তত্ত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে নি, তিনি দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন না, কিন্তু তিনি তাঁর শিক্ষাচিন্তাকে বাস্তবায়িত করার জন্য এমন এক সময় নির্বাচন করেছিলেন, যখন দেশে রাজনৈতিক আন্দোলনকে কেন্দ্র করে জোরালো জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের ঝড় উঠেছে। তাই তাঁর বাস্তববাদী শিক্ষাচিন্তা অনেকাংশে জাতীয় আন্দোলনকে প্রভাবিত করেছিল। তিনি প্রত্যক্ষভাবে এই জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনকে সমর্থন করেছিলেন। তবে নিজের বিশ্বাস বা আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে নয়। অর্থাৎ তিনি সমসাময়িক কালের শিক্ষা আন্দোলনের পাশাপাশি থেকেও তৎকালীন গণ আবেশে নিজেকে ভাসিয়ে দিতে পারেন নি। তার কারণ, তাঁর নিজস্ব চিন্তা ভাবনায়, শিক্ষার একটি পরিপূর্ণ কাঠামো ছিল।

যৌবনের প্রারম্ভেই রবীন্দ্রনাথ জমিদারী দেখা উপলক্ষে দেশের জনগণের দুর্গতি, হীনতা, অসহায় নিশ্চেষ্টতা, মনুষ্যত্বের চূড়ান্ত অবমাননা তাঁর চারিদিকে প্রত্যক্ষ করলেন। তাঁর কবিতায়, গানে, প্রবন্ধে এসব বিষয় আলোড়ন সৃষ্টি করল। ১৮৯১–৯২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি লিখলেন – শিক্ষার হেরফের। এর ভিতর দিয়ে বিদেশী শিক্ষার মাধ্যমে জাতীয় ক্ষয়ক্ষতি সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো, জাতীয় শিক্ষার প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। তারপর একে একে ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ, শিক্ষা সংস্কার, শিক্ষা সমস্যা, জাতীয় বিদ্যালয়, আবরণ, শিক্ষা ও সংস্কৃতি, আশ্রমের শিক্ষা, শিক্ষার মিলন, স্ত্রী শিক্ষা, শিক্ষার ধারা, লক্ষ্য ও শিক্ষা, তপোবন, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য, শিক্ষার বাহন, পথের সঞ্চয়, শিক্ষাবিধি ইত্যাদি শিক্ষা সংক্রান্ত নানা প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে থাকে।

পিতা দেবেন্দ্রনাথের কাছ থেকে রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন উপনিষদের ভালবাসা। সেই সূত্রেই প্রাচীন ভারতের তপোবনের শিক্ষাদর্শ তাঁর শিক্ষা চিন্তার উপর গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করে। দার্শনিক চিন্তার দিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথ মূলত ছিলেন ভাববাদী। সেজন্য পৃথিবীর মূলে যে আধ্যাত্মিক সত্য বিরাজমান তাকেই কবি উপলব্ধি করতে চেয়েছিলেন। তাঁর সর্বব্যাপী জীবনদর্শন শিক্ষাকেও স্পর্শ করেছিল। তাই রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা পরিকল্পনায় জীবনদর্শী সাধকের দৃষ্টি ছিল।

রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয় করতে গিয়ে ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, যে কোন আদর্শ শিক্ষণ পদ্ধতি মূল তিনটি নীতি মেনে চলবে – (১) স্বাধীনতা (২) সৃজনাত্মক আত্মপ্রকাশের সুযোগ এবং (৩) প্রকৃতির সঙ্গে সক্রিয় সংযোগ। ১৯০১ খ্রীঃ জগদীশচন্দ্র বসুকে বোলপুরের আশ্রম বিদ্যালয় সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন যে, এই বিদ্যালয়ে যারা অধ্যয়ণ করতে আসবে তারা শিক্ষকের পরিচালনাধীন কোন আইন শৃঙ্খলার অধীন হবে না। তারা এখানে অসীম স্বাধীনতা ভোগ করবে। স্বাধীন ভাবে চলতে চলতে তারা আত্মশৃঙ্খলায় বিশ্বাসী হবে। কেউই আত্মমর্যাদা বিসর্জন দেবে না, অন্যায়ের সঙ্গে কোন প্রকার আপোষ করবে না। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাক্ষেত্রে স্বাধীনতা বলতে স্বেচ্ছারের অধিকারকে বোঝান নি। তিনি স্বাধীনতাকে আত্মকর্তৃত্বের সমতুল্য হিসেবে বিচার করেছেন। তিনি বলেছেন, শিশুদের স্বাধীনতা

Scanned with CamScanner

দিলে, তাঁরা নিজেদের সমস্ত শক্তি উন্মোচনের সুযোগ পায় এবং বন্ধনমুক্ত হয়ে বিশ্বের চিরন্তন শক্তিগুলির সঙ্গে অবাধ ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার আয়োজন করে। পরবর্তী পর্যায়ে তিনি বলেছেন, এই স্বাধীনতা বা আত্মকর্তৃত্বের প্রধান লক্ষণ হল সৃষ্টি কর্তৃত্ব। স্বাধীন পরিবেশের মধ্যেই সৃজন প্রতিভার বিকাশ হতে পারে এবং সৃজনকর্মের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী নিজেকে বিকশিত করতে পারে।

সৃষ্টিক্ষমতার উদ্বোধন ঘটানো যদি শিক্ষার উদ্দেশ্য হয় তাহলে শিক্ষার জগতে কোনরকম সংকীর্ণতা স্বীকার্য নয়। শিক্ষার ওপর মানুষের অধিকার জন্মগত। সুতরাং শিক্ষার ব্যাপারে যাঁরা এদেশ-ওদেশের মধ্যে ভেদাভেদ টানেন, নারী পুরুষের শিক্ষার অধিকার নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করেন তাঁরা তামসিকতায় ভোগেন। রবীন্দ্রনাথ 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধে বলেছিলেন – "স্বাজাত্যের অহমিকা থেকে মুক্তিদান করার শিক্ষাই আজকের দিনের প্রধান শিক্ষা। এই জন্যই আমাদের দেশের বিদ্যানিকেতনকে পূর্ব-পশ্চিমের মিলন নিকেতন করে তুলতে হবে। এই আমার অন্তরের কামনা।"[৫] রবীন্দ্রনাথ বলেছেন তথ্য জ্ঞাপন প্রক্রিয়া কখনই শিক্ষা হতে পারে না। সর্বোচ্চ শিক্ষা কেবলমাত্র তথ্য পরিবেশন করে না, বিশ্বসত্তার সঙ্গে ব্যক্তি সত্তার সংগতি রাখতে সহায়তা করে। ভারতী পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন যে "বঙ্গদেশে এমন একটি সৃষ্টিছাড়া শিক্ষাপ্রণালী প্রচলিত হয়েছে যে তাতে শিক্ষিতেরা বিজ্ঞান, দর্শনের কতকগুলি বুলি এবং ইতিহাসের সাল, ঘটনা ও রাজাদিগের নামাবলী মুখস্থ করতে পেরেছেন বটে, কিন্তু তাঁদের রুচিরও উন্নতি করতে পারেন নি বা স্বাধীনভাবে চিন্তা করতেও শেখেন নি।" অর্থাৎ তাঁর মতে শিক্ষার অর্থ কতকগুলি তথ্য বা কিছু জ্ঞান আহরণ করা নয়। শিক্ষা হল জীবন বিকাশের এমন এক প্রক্রিয়া যার মধ্য দিয়ে মানুষ বিশ্বচেতনার প্রকৃত আনন্দময় রূপ উপলব্ধি করতে পারে। শিক্ষার উপলব্ধিই প্রধান, তথ্য নয়।

মূলত দুইটি প্রধান কারণে রবীন্দ্রনাথ এ দেশে ইংরেজদের শিক্ষানীতি ও ব্যবস্থার বিরোধিতা করেছেন – এক নিতান্ত অসম্পূর্ণ ও নিরানন্দ শিক্ষানীতি এবং জীবন ও পদ্ধতিবিমুখ ও ক্লাসনামধারী খাঁচার জিনিস এই শিক্ষাব্যবস্থা – যা মানুষ তৈরি করে না, কেরানি তৈরি করে। দুই, এ শিক্ষার সুযোগ সকলের জন্য নয়, সংখ্যালঘু একদল লোকের জন্য। অপরদিকে তৎকালীন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্বন্ধে বলেছেন – "সকলেই জানেন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাঁচে তৈরি। ঐ বিদ্যালয়টি পরীক্ষায় পাস করা ডিগ্রীধারীদের নামের উপর মার্কা মারিবার একটা বড়ো গোছের শীলমোহর। মানুষকে তৈরি করা নয়, মানুষকে চিহ্নিত করা তার কাজ। মানুষকে হাটের মাল করিয়া তার বাজার দর দাগিয়া দিয়া ব্যবসাদারির সহায়তা সে করিয়াছে।"[৬]

রবীন্দ্রনাথ ভারতে প্রচলিত গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থার বিভিন্ন সময়ে সমালোচনা করেছেন। তিনি দেখেছিলেন দেশে ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থায় ভারতীয় আদর্শ বা রীতিনীতিকে কোন স্থান দেওয়া হয় নি। ভারতবর্ষের প্রাচীন ঋষিরা চিরদিন মানুষের নৈতিক গুণগুলি বিকাশের উপর গুরুত্ব দিয়ে এসেছেন, চিরদিনই তাঁরা বিশ্বসত্তার

Scanned with CamScanner

বিভিন্ন প্রকাশমান রূপের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তাই ভারতের শিক্ষার লক্ষ্য তার জাতীয় চিন্তন বৈশিষ্ট্যের প্রতীক হিসেবে যদি দেখা না দেয়, তাহলে তা সমাজের উদ্দেশ্য সাধন করতে পারবে না। রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন – "কেবল ইন্দ্রিয়ের শিক্ষা নয়, কেবল জ্ঞানের শিক্ষা নয়, বোধের শিক্ষাও আমাদের বিদ্যালয়ে স্থান দিতে হবে।"[৭] তিনি ভারতীয় শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রে জ্ঞানের শিক্ষাকে একেবারে অস্বীকার করেন নি। তিনি জ্ঞানের সঙ্গে বোধের সমন্বয় সাধন করে শিক্ষার বিশেষধর্মী লক্ষ্যগুলি নির্ধারণের পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁর মতে শিক্ষার লক্ষ্য হবে – (১) শিক্ষার্থীর জীবন বিকাশ, যে বিকাশের ফলে সে বিশ্বচেতনাকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারবে। (২) শিক্ষার্থীর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী জাগ্রত করা, যার সাহায্যে শিক্ষার্থী বিশ্বপ্রকৃতির রহস্য উদ্‌ঘাটনে সচেষ্ট হবে। (৩) শিক্ষার্থীর মধ্যে ধর্মীয়ভাব জাগ্রত করা এবং ভারতীয় আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নৈতিক ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলীর বিকাশ সাধন করা। (৪) শিক্ষার্থীর সামাজিক বিকাশে সহায়তা করা, যাতে সে ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে সার্থকভাবে উপলব্ধি করতে পারে। রবীন্দ্রনাথ, এক কথায় এই সব উদ্দেশ্যগুলিকে সুন্দরভাবে ব্যক্ত করে বলেছেন – মানুষকে তার শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী করে গড়ে তোলা, তার প্রকৃত জীবনাদর্শ গঠনে সাহায্য করা, তার প্রকাশভঙ্গীকে ছন্দময় করে তোলা এবং তার মধ্যে চারিত্রিক বলিষ্ঠতা এনে দেওয়ায় হবে শিক্ষার লক্ষ্য। 'লক্ষ্য ও শিক্ষা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন – "শিক্ষা জিনিসটা তো জীবনের সঙ্গে সংগতিবিহীন একটি কৃত্রিম জিনিস নহে। আমরা কি হইব এবং আমরা কি শিখিব এই দুটো কথা একেবারে গায়ে গায়ে সংলগ্ন।"[৮]

শিক্ষা বলতে রবীন্দ্রনাথ বুঝেছেন এমন একটি তপস্যা যা আমাদের বিশ্ব জীবনের সঙ্গে যুক্ত করে, আমাদের ক্ষুদ্র সত্তা ও অনন্ত শক্তির মধ্যে সঙ্গতি বিধান করে। এই সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য বিধান শিক্ষার মূলকথা। তিনি বলেছেন শিক্ষা হবে প্রতিদিনের জীবনযাত্রার একটি অঙ্গ – চলবে এক তারে। তাই তিনি বাগান পরিচর্যার কাজ, গ্রন্থগার গোছাবার কাজ, নাটক রচনা, অভিনয়, সঙ্গীত, বিভিন্ন ধরণের হাতের কাজ ইত্যাদির উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন তাঁর প্রস্তাবিত শিক্ষণ পদ্ধতিতে। গতানুগতিক পুঁথিগত বিদ্যা অধ্যয়নের পরিবর্তে কবি কর্মমুখী শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। বিদ্যালযের ছাত্রদের জন্য তিনি এমন সব কাজকর্মের প্রচলন করেছিলেন, যার মধ্য দিয়ে তারা বৃহত্তর কর্মজগতের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পাবে। এ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে কবি বলেছেন – "গো পালনে ছাত্রদের যোগ দিতে হইবে। পাঠের বিশ্রাম-কালে তারা স্বহস্তে বাগান করিবে, গাছের গোড়া খুঁড়িবে, গাছে জল দিবে, বেড়া বাঁধিবে। এইরূপে তাঁহারা প্রকৃতির সঙ্গে কেবল ভাবের নহে, কাজের সম্বন্ধও পাতাইতে থাকিবে।"[৯] তাই বিদ্যালয়রূপী খোপওয়ালা বড় বাক্সের ক্ষুদ্র গণ্ডি থেকে ছাত্রছাত্রীদের মুক্তি দেওয়ার জন্য শান্তিনিকেতনের উন্মুক্ত প্রান্তরে পল্লী প্রকৃতির ক্রোড়ে ব্রহ্মচর্যাশ্রম নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন, বিশ্ব প্রকৃতির সঙ্গে শিক্ষার্থীদের

Scanned with CamScanner

অন্তরের একটা সুনিবিড় সংযোগ স্থাপনে প্রয়াসী হয়েছিলেন তিনি। স্পষ্ট করে কবি তাই বলেছেন – "মাঠের মাঝখানে এই আমাদের আশ্রমের বিদ্যালয়। এখানে আমরা বড়োয় ছোটোয় একসঙ্গে থাকি, ছাত্র ও শিক্ষক এক ঘরে শয়ন করি, তেমনি এখানে আরো আমাদের সঙ্গী আছে, আকাশ, আলোক এবং বাতাসের সঙ্গেও আমরা কোনো আড়ালের সম্পর্ক রাখি নাই। এখানে ভোরের আলো একেবারে আমাদের চোখের উপর আসিয়া পড়ে, আকাশের তারা একেবারে আমাদের মুখের উপর তাকাইয়া থাকে। ঝড় যখন আসে সে একেবারে দিকপ্রাচ্যে ধূলার উত্তরীয় দুলাইয়া বহু দূর হইতে আমাদের খবর দিতে থাকে। কোনো ঋতু যখন আসন্ন হয় তখন তাহার প্রথম সংবাদটি আমাদের গাছের পত্রে পত্রে প্রকাশিত হয়।।"[১০]

ভারতের প্রাচীন তপোবন বিদ্যালয়ের আদর্শ কবি মানসে এক বিস্ময়কর প্রভাব বিস্তার করেছিল। তপোবনের শিক্ষাকে তিনি শান্তিনিকেতনের শিক্ষাধারার মধ্যে প্রতিফলিত করতে চেয়েছিলেন। আর্মকুঞ্জের ছায়ায় বিহঙ্গের কলকাকলীর মধ্যে সবুজ প্রাণের উচ্ছ্বাস ঘটে। সেই স্নিগ্ধ পরিবেশে শিক্ষার আয়োজন যে সার্থক হয়ে উঠতে পারে, তা তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলেন। তাই প্রাচীন তপোবনের আদর্শে অরণ্য প্রকৃতির উদার উন্মুক্ত পরিবেশে তিনি বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন। "আমার আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, শান্তিনিকেতনের গাছপালা, পাখীই এদের শিক্ষার ভার নেবে। আমার একান্ত ইচ্ছা ছিল যে এখানকার এই প্রভাতের আলো, শ্যামল প্রান্তর, গাছপালা যেন শিশুদের চিত্তকে স্পর্শ করতে পারে।"[১১]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিক্ষাচিন্তায় পাঠক্রমের ব্যাপক তাৎপর্যকে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করেছিলেন। পাঠক্রমের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর সামনে মানব সংস্কৃতির সম্পূর্ণ রূপটি তুলে ধরতে হবে। এই ছিল তাঁর অভিমত। 'শিক্ষা ও সংস্কৃতি' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বললেন, শিক্ষার দ্বারা মানুষের ভিতর থেকে ইতরতার বিষবীজ দূর করার জন্য প্রয়োজন – "মানুষের ইতিহাসে যা কিছু ভাল তার সঙ্গে আনন্দময় পরিচয় সাধন করিয়ে তার প্রতি শ্রদ্ধা অনুভব করবার সুযোগ সর্বদা ঘটিয়ে দেওয়া।"[১২]

শিক্ষার উদ্দেশ্য যদি হয় বিশ্বমানবের সংস্কৃতির সঙ্গে শিক্ষার্থীর পরিচয় ঘটানো, তাহলে শিক্ষার পাঠক্রমকে অবশ্যই হতে হবে ঐ সংস্কৃতির বাহক। রবীন্দ্রনাথ বিদ্যালয়কে মানব সংস্কৃতির অনুশীলনের ক্ষেত্র হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। আর বিদ্যালয়ের পাঠক্রম রচনার জন্য সেই সব বিষয়কে নির্বাচন করার কথা বলেছেন যাদের মধ্য দিয়ে মানব সংস্কৃতিকে প্রতিফলিত করা সম্ভব হবে। এইজন্য তিনি পাঠক্রমের মধ্যে ভাষা ও সাহিত্য, দর্শন, শিল্পকলা, সঙ্গীত, নৃত্য, পল্লী উন্নয়ন মলূক কাজ ওঅন্যান্য সামাজিক কাজকে অন্তর্ভূক্ত করতে চেয়েছিলেন।

শিক্ষার বাহন হিসাবে তিনি মাতৃভাষার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। শিক্ষার হেরফের প্রবন্ধে তিনি বলেছেন মাতৃভাষাই হবে শিক্ষার মাধ্যম। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তার কথা বলতে গিয়ে তিনি মাতৃভাষাকে তুলনা করেছেন মাতৃদুগ্ধের

Scanned with CamScanner

সঙ্গে। মাতৃভাষার মাধ্যমেই শিক্ষার্থীরা শিক্ষণীয় বিষয়গুলিকে সবচেয়ে অল্পায়াসে আয়ত্ত করতে পারে। মাতৃভাষার পরিবর্তে একটি বিদেশী ভাষাকে শিক্ষাদানের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করা হলে শিক্ষার্থীর শিক্ষা গ্রহণের পথে গুরুতর বাধার সৃষ্টি করা হবে বলে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন। "বিদ্যাবিস্তারের কথাটা যখন ঠিকমত মন দিয়া দেখি তখন তার সর্বপ্রধান বাধাটা এই দেখিতে পাই যে তার বাহনটা ইংরেজি। বিদেশী মাল জাহাজে করিয়া শহরের ঘাট পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছিতে পারে কিন্তু সেই জাহাজটাতে করিয়াই দেশের হাটে হাটে আমদানি রপ্তানি করাইবার দুরাশা মিথ্যা। যদি বিলিতি জাহাজটাকেই কায়মনে আঁকড়াইয়া ধরিতে চাই তবে ব্যবসা শহরেই আটকা পড়িয়া থাকিবে।"[১৩] কিন্তু ভাষা শিক্ষার প্রশ্নটি বিচার করবার সময় তিনি কখনও আবেগকে প্রশ্রয় দেননি। তাই মাতৃভাষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেও তিনি ইংরেজী ভাষার প্রয়োজনীয়তাকে কখনও অস্বীকার করেন নি। তাঁর শিক্ষা পরিকল্পনায় ইংরেজী সহ বিভিন্ন ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি স্বীকার করেছেন। এছাড়া ভারতবর্ষের একটি বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মাতৃভাষা হিসাবে হিন্দী ভাষাচর্চা করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে কবি যথেষ্ট দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন। বিশ্বভারতীতে তিনি মাতৃভাষা ছাড়াও হিন্দী, উর্দু, সংস্কৃত প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি লিখেছেন – "ভারতবর্ষেও ভিন্ন ভিন্ন ভাষার উৎকর্ষ সাধনে দ্বিধা করলে চলবে না। মধ্যযুগে য়ুরোপে সংস্কৃতির এক ভাষা ছিল ল্যাটিন। সেই ঐক্যের বেড়া ভেদ করেই য়ুরোপের ভিন্ন ভিন্ন ভাষা যেদিন আপন আপন শক্তি নিয়ে প্রকাশ পেলে সেই দিন য়ুরোপের বড়ো দিন। আমাদের দেশেও সেই বড়োদিনের অপেক্ষা করব – সব ভাষা একাকার করার দ্বারা নয়। সব ভাষার আপন আপন বিশেষ পরিণতির দ্বারা।"[১৪]

সভ্যতার অগ্রগতির জন্য বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তার কথা রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছিলেন এবং একই সঙ্গে ব্যক্তিজীবনের উন্নতির জন্য জীবন দর্শনের প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তিনি একই সঙ্গে বিজ্ঞান ও দর্শনকে পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্তির পরামর্শ দিয়েছিলনে। বিশ্ব প্রকৃতির সৌন্দর্যকে সার্থকভাবে উপলব্ধি করার জন্য শিল্পকলাকে পাঠক্রমে রাখার পক্ষপাতী তিনি ছিলেন। আবার, তিনি বলেছেন, শিক্ষার্থীকে তার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত করার জন্য সঙ্গীত, নৃত্য ইত্যাদিকে বিদ্যালয়ে চর্চার ব্যবস্থা রাখতে হবে। ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচিত করার জন্য রবীন্দ্রনাথ পাঠক্রমে রামায়ণ ও মহাভারতকে অন্তর্ভুক্ত করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। সবশেষে সমাজ জীবনের প্রতি সমালোচনামূলক মনোভাব গড়ে তোলার জন্য এবং শিক্ষার্থীর সামাজিক বিকাশে সহায়তা করার জন্য রবীন্দ্রনাথ পাঠক্রমে বিভিন্ন ধরণের সমাজসেবা ও সমাজ উন্নয়ন কাজে অংশগ্রহণের কর্মসূচীকে রাখারও পক্ষপাতী ছিলেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রস্তাবিত পাঠক্রমের ভিতর সম্পূর্ণ মানবের শিক্ষার উপযোগী সকল রকম বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছিলেন। তাই তাঁর প্রস্তাবিত পাঠক্রমের বিস্তৃতি ছিল অনেক ব্যাপক।

Scanned with CamScanner

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে গুরু শিষ্যের সম্পর্ক। কারণ পরস্পর মেলামেশার মধ্য দিয়েই জ্ঞানকে অনুভূতির সাহায্যে আত্মস্থ করা সম্ভব। তিনি আদর্শ গুরুর কল্পনায় তপোবনের গুরুকেই দেখেছেন – "দেখেছি মনে মনে তপোবনের কেন্দ্রস্থলে গুরুকে। তিনি যন্ত্র নন, তিনি মানুষ – নিষ্ক্রিয়ভাবে মানুষ নন, সক্রিয়ভাবে। কেননা মনুষ্যত্বের লক্ষ্য সাধনেই তিনি প্রবৃত্ত।" রবীন্দ্রনাথ আবার বলেছেন — "গুরুর অন্তরে ছেলেমানুষটি যদি একবারে শুকিয়ে কাঠ হয়েছে তিনি ছেলেদের ভার নেবার অযোগ্য। উভয়ের মধ্যেই শুধু সামীপ্য নয়, আন্তরিক সাযুজ্য ও সাদৃশ্য থাকা চাই, ... নইলে দেনা পাওনায় নাড়ীর যোগ থাকে না।"[১৫] শিক্ষার্থী যেমন শ্রদ্ধার সঙ্গে জ্ঞান আহরণ করবে, তেমনি শিক্ষক ও শ্রদ্ধার সঙ্গে জ্ঞান বিতরণ করবেন। শ্রদ্ধার সঙ্গে দান করলে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। সেখানে এই শ্রদ্ধার সম্পর্ক নেই। সেখানে আদান প্রদানের সম্বন্ধ কলুষিত হয়ে ওঠে।

জনশিক্ষার দিকেও রবীন্দ্রনাথের সজাগ দৃষ্টি ছিল, তিনি জানতেন যে ভারতের অগণিত জনসাধারণ জ্ঞানের আলোক থেকে বঞ্চিত বিশেষ করে যারা জননী, যাদের উপর জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে তাদেরকে শিক্ষিত করে তোলা অবশ্য প্রয়োজন। পরিবার থেকে শুরু হবে শিক্ষার উন্মেষ, প্রতিটি পরিবার শিক্ষার বুনিয়াদ গড়বে। শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের ভার নেবে। তাই তিনি লোকশিক্ষা সংসদের প্রতিষ্ঠা করেন। "যে শিক্ষায় আমাদের প্রয়োজন তা শুধু শহরবাসীর জন্য নয়। সমস্ত দেশের মধ্যে তার ধারাকে প্রবাহিত করতে হবে। ... আজ আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো দরকার শিক্ষার সাম্য।" রবীন্দ্রনাথ জাতিকে জনশিক্ষার মাধ্যমে সচেতন করে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন।

তাঁর শিক্ষা পরিকল্পনায় গ্রামোন্নয়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ দখল করে আছে। শান্তিনিকেতনের চারপার্শ্বে যে সমস্ত গ্রাম আছে, সেগুলিকে কেন্দ্র করে শিক্ষার্থী. জনসেবার কাজে এগিয়ে যাবে। এটাই ছিল রবীন্দ্রনাথের কামনা। শিক্ষার সঙ্গে কাজের সেবার নিবিড় যোগাযোগ সাধনের নিমিত্ত তিনি বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। এতে শিক্ষার্থীরা শ্রমের প্রতি মর্যাদা দিতে শিখবে। সকল শ্রেণীর মানুষকে আপন ভাবতে পারবে। গ্রাম্য জীবনের সঙ্গে শিক্ষাকে যুক্ত করে তুলবার জন্যই রবীন্দ্রনাথ লোক সেবক ব্রতীদল গঠন করেছিলেন।

লক্ষ্য করা যেতে পারে, প্রচলিত শিক্ষাদর্শ, শিক্ষালয় সমূহের ভূমিকা, বিভিন্ন দেশীয় ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা – শিক্ষাকে চিৎপ্রকর্ষ সাধনের উপায় রূপে গণ্য করা প্রভৃতির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা সম্পর্কে আমাদের প্রচলিত ধারণার ওপর আঘাত করেছিলেন। বস্তুত রবীন্দ্রনাথ নামক একজন স্রষ্টার পক্ষে জীবনে কোন সত্যকেই পৃথকভাবে দেখা সম্ভব ছিল না। শিক্ষাই হোক, শিল্প-সাহিত্যই হোক, সবই মানবচিত্ত তত্ত্বের মূল রহস্যের অঙ্গীভূত, পৃথকী এক একটি প্রক্রিয়ার ফসল নয়। যাবতীয় দর্শনের মত রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনও একটি সমগ্রতা হওয়ায় তাঁর সুন্দর ভাবনা ও শিক্ষা ভাবনা পরস্পর সাপেক্ষতায় আত্মপ্রকাশ করেছিল।❑

Scanned with CamScanner